নারী কর্মক্ষেত্রেঃ তাঁরা কি সত্যিই হেরে যায়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলি?

লেখক: অনুভব রহমান | প্রকাশিত: 15 October 2026, 12:28 PM | বিভাগ: এইচআরএম

স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ নারীর অদেখা বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নেতৃত্বের অপ্রকাশিত গল্প

“মানুষ কী ভাববে?” অদৃশ্য সামাজিক নজরদারি

বাংলাদেশের করপোরেটে বাস্তবতায় অনেক নারী প্রতিদিন এক ধরনের অদৃশ্য সামাজিক নজরদারির মধ্যে কাজ করেন। তাঁদের কর্মজীবনের অনেক সিদ্ধান্ত শুধু পেশাগত বাস্তবতা দিয়ে নির্ধারিত হয় না; এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক প্রত্যাশা এবং সম্ভাব্য বিচার। ফলে একজন নারী অনেক সময় শুধু কাজ নিয়ে ভাবেন না। তিনি ভাবেন কীভাবে কথা বলব? কতটা দৃঢ় হব? কতটা দৃশ্যমান হব? বেশি দৃঢ় (অ্যাসারটিভ) দেখালে কী হবে? বেশি ফ্রেন্ডলি দেখালে কী হবে? বেশি উচ্চাকাঙ্খী দেখালে মানুষ কী ভাববে? অনেক সময় তিনি নিজের সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য ফলাফলের চেয়ে সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বেশি ভাবতে বাধ্য হন। একজন পুরুষের ক্ষেত্রে যে আচরণকে নেতৃত্বের গুণ হিসেবে দেখা হয়, একজন নারীর ক্ষেত্রে একই আচরণ কখনো কখনো ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে অনেকে

নারী ধীরে ধীরে নিজেদের প্রকাশ সীমিত করতে শুরু করেন। নিজেদের প্রকৃত ব্যক্তিত্বের কিছু অংশ আড়াল করেন। কিছু মতামত নিজের মধ্যেই রাখেন। কিছু ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। কিছু সুযোগের জন্য নিজেকে সামনে আনেন না। সবকিছু মিলিয়ে এটি এমন এক বাস্তবতা তৈরি করে, যেখানে একজন মানুষ তাঁর সম্পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন না। এটি শুধুমাত্র একটি সামাজিক সমস্যা নয়। এটি একটি সাংগঠনিক সমস্যা। এটি একটি নেতৃত্বগত সমস্যা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি প্রতিভা দমন (ট্যালেন্ট সাপ্রেশন)-এর একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী রূপ। কারণ যখন একজন মানুষ নিজের সামর্থ্যের চেয়ে ছোট হয়ে কাজ করতে বাধ্য হন, তখন ক্ষতিটা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়; ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্বের পাইপলাইন এবং শেষ পর্যন্ত পুরো কর্মক্ষেত্র।

“গুড গার্ল সিনড্রোম” যে বিষয়ে আমরা খুব কম কথা বলি

বাংলাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কৃতি মেয়েদের অনেক ইতিবাচক মূল্যবোধ শেখায়। সম্মান করতে শেখায়। দায়িত্ব নিতে শেখায়। সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতে শেখায়। অন্যের প্রতি সংবেদনশীল হতে শেখায়। কিন্তু একই সঙ্গে অনেক সময় এমন কিছু মানসিক কাঠামোও তৈরি করে, যা কর্মজীবনের

প্রতিযোগিতামূলক বাস্তবতায় অদৃশ্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেক পরিবারেই মেয়েকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় ভদ্র হও। বেশি তর্ক করো না। সবাইকে খুশি রাখো। না বলতে নেই। অন্যের জন্য আগে ভাবো। এসব শিক্ষা অবশ্যই জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবান। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কখনো কখনো এগুলো ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সম্পর্ক রক্ষা, সমন্বয় করা এবং অন্যের চাহিদাকে

অগ্রাধিকার দেওয়ার শিক্ষা বেশি পায়। অন্যদিকে ছেলেদের তুলনামূলকভাবে নিজের মত প্রকাশ, ঝুঁকি নেওয়া এবং ব্যক্তিগত অর্জনের দিকে বেশি উৎসাহিত করা হয়। ফলে কর্মজীবনে এসে অনেক নারী দক্ষতা বা যোগ্যতার অভাবে নয়, বরং নিজের প্রাপ্য দাবি করা, দৃশ্যমান হওয়া কিংবা নিজের পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন। এর ফলস্বরূপ অনেক নারীকর্মী পদোন্নতির জন্য নিজেকে সামনে আনেন না। সেলারী নেগোসিয়েশন করতে অস্বস্তি বোধ করেন। লিডারশিপ রোল-এর জন্য আবেদন করতে দ্বিধা করেন। নিজের অর্জন ও অবদান তুলে ধরতে সংকোচ বোধ করেন। কারণ তাঁদের ভেতরে একটি অদৃশ্য প্রশ্ন কাজ করে-

“মানুষ কী ভাববে?”

আমি কর্মজীবনে এমন অনেক নারীকে দেখেছি, যাঁরা কাজের যোগ্যতায় নয়, বরং নিজের প্রাপ্য দাবি করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন। তাঁরা কাজ করেছেন। ফলাফল দিয়েছেন। দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু নিজেদের অর্জনের গল্পটি নিজেরাই বলেননি। অথচ করপোরেট জগৎ সবসময় শুধু আপনার কাজ দেখে

না। অনেক সময় আপনার দৃশ্যমানতাও দেখে। আপনার উপস্থিতিও দেখে। আপনি নিজের সম্ভাবনার পক্ষে কতটা কথা বলতে পারেন, সেটিও দেখে। কারণ আপনি যদি নিজের অর্জনের গল্পটি না বলেন, অনেক সময় অন্য কেউ সেটি বলবে না। আর বললেও হয়তো সেটি আপনার প্রকৃত অবদানকে পুরোপুরি তুলে ধরবে না। আর ঠিক সেখানেই অনেক মেধাবী নারী অজান্তেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন। যোগ্যতার অভাবে নয়। নিজেদের সামনে নিয়ে আসতে না পারার কারণে। কখনো কখনো সমস্যাটি সক্ষমতার নয়। সমস্যাটি হলো সক্ষমতাকে দৃশ্যমান করে তোলার।

অফিসে কাজ, ঘরে দ্বিতীয় শিফট

কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করি। কিন্তু অনেক সময় ভুলে যাই যে অফিসের কাজই তাঁদের দিনের শেষ কাজ নয়। একজন পুরুষ অফিস থেকে ফিরলেন। একজন নারীও ফিরলেন। দুজনেরই দিন ছিল দীর্ঘ। দুজনেই ক্লান্ত। কিন্তু অফিসের দরজা পেরিয়ে তাঁদের দিনের গল্প আর এক থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই দিনের বাকি অংশ এক রকম হয় না। অনেক নারীর জন্য অফিস শেষে শুরু হয় আরেকটি কর্মদিবস। আরেকটি দায়িত্বের তালিকা। আরেকটি শিফট। সন্তানের যত্ন। পরিবারের প্রয়োজন। গৃহস্থালির সমন্বয়। বয়স্ক সদস্যদের দেখাশোনা। সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব। এসব কাজের অনেকগুলোর কোনো চাকরির বর্ণনা নেই। কোনো বেতন নেই। কোনো পারফরম্যান্স রেটিং নেই। কিন্তু দায়িত্ব আছে। প্রত্যাশা আছে। আর প্রায়শই সেই প্রত্যাশাগুলো নীরব। ফলে অনেক নারীর কর্মদিবস অফিস ছাড়ার সঙ্গে শেষ হয় না। বরং নতুন রূপে আবার শুরু হয়। আমরা ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে কথা বলি। কিন্তু বহু নারীর বাস্তবতা হলো-

ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স নয়। ওয়ার্ক-লাইফ সারভাইবল

আর বছরের পর বছর এই ভারসাম্যহীন চাপ বহন করতে করতে অনেকেই ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যোগ্যতার অভাবে নয়। প্রচেষ্টার অভাবে নয়। বরং একই সময়ে একাধিক পূর্ণকালীন দায়িত্ব বহন করার কারণে। আর সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো, এই অতিরিক্ত চাপের স্বীকৃতিও অনেক সময় মেলে না। এমনকি ক্লান্তির কথা বললেও কখনো কখনো শুনতে হয় “তোমাকে তো কেউ কাজ করতে বাধ্য করেনি।” “এত কষ্ট হলে চাকরি ছেড়ে দাও।” “এটা তো তোমার নিজের সিদ্ধান্ত।” বাক্যগুলো শুনতে হয়তো সাধারণ মনে হয়। কিন্তু এর ভেতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা লুকিয়ে থাকে যেন একজন নারীর পেশাগত স্বপ্ন, ক্যারিয়ার কিংবা আত্মপরিচয় কোনো প্রয়োজন নয়; বরং একটি ঐচ্ছিক বিষয়, যা প্রয়োজনে ত্যাগ করা যেতে পারে। আর ঠিক সেখানেই সমস্যাটি আরও গভীর হয়ে ওঠে। কারণ একজন পুরুষের ক্যারিয়ারকে আমরা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একজন নারীর ক্যারিয়ারকে এখনও এমন কিছু হিসেবে দেখা হয়, যা পরিস্থিতি কঠিন হয়ে গেলে সবার আগে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। আর সেই ক্লান্তির প্রভাব সবসময় দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু তা প্রভাব ফেলে আত্মবিশ্বাসে। উচ্চাকাঙ্ক্ষায়। নতুন সুযোগ গ্রহণের আগ্রহে। এবং অনেক সময় নেতৃত্বের পথে এগিয়ে যাওয়ার

সাহসেও। কারণ মানুষ সাধারণত একদিনে হাল ছেড়ে দেয় না। সে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়। আর সেই ক্লান্তি অনেক সময় একজন মানুষের স্বপ্নকেও ছোট করে দেয়।

মাতৃত্বের পরে অদৃশ্য জরিমানা

মাতৃত্ব একজন নারীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ, স্বাভাবিক এবং উদযাপনযোগ্য অধ্যায়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের বাস্তবতায় অনেক সময় এটি এমনভাবে বিবেচিত হয়, যেন একজন দক্ষ পেশাজীবীর সক্ষমতা, প্রতিশ্রুতি বা দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা হঠাৎ করেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অবশ্যই সব প্রতিষ্ঠান বা সব ব্যবস্থাপক এমনটি করেন না। তবে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমি এমন বহু উদাহরণ দেখেছি, যেখানে মাতৃত্বের পরে একজন নারীর প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা এবং আচরণ সূক্ষ্মভাবে বদলে গেছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে ফিরে আসার পর বড় প্রকল্প আর তাঁর হাতে দেওয়া হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের সুযোগ কমে গেছে। ভ্রমণভিত্তিক বা দৃশ্যমান দায়িত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতির আলোচনায় তাঁর নাম আগের মতো আর সামনে আসেনি। কেউ সরাসরি বলেনি, “তিনি পারবেন না, কেউ বলেনি, তিনি আর নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত নন।”

কিন্তু অনেক সময় সিদ্ধান্তগুলোই সেই বার্তা বহন করেছে। আর সমস্যাটি সেখানেই। কারণ এই পরিবর্তনগুলো সাধারণত প্রকাশ্য বৈষম্য হিসেবে দেখা যায় না। এগুলো আসে অনুমান থেকে। ধারণা থেকে। কখনো কখনো অতিরিক্ত সহানুভূতি থেকেও। ধরে নেওয়া হয় তিনি হয়তো এখন বেশি দায়িত্ব নিতে চাইবেন না। ভ্রমণ করতে পারবেন না। নতুন চ্যালেঞ্জে আগ্রহী হবেন না। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গবেষণায় এই প্রবণতাকে প্রায়ই “মাদারহুড পেনাল্টি” বলা হয়। অর্থাৎ মাতৃত্বের পরে একজন নারীর ক্যারিয়ারের গতি, সুযোগ কিংবা মূল্যায়ন এমনভাবে প্রভাবিত হয়, যা একই পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ কর্মীর ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না। এবং সত্য হলো বাংলাদেশের করপোরেট বাস্তবতায়ও এই অদৃশ্য জরিমানা এখনও পুরোপুরি দূর হয়ে যায়নি। কেউ হয়তো চাকরি হারান না। কিন্তু অনেক সময় হারিয়ে যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। একটি পদোন্নতি। একটি নেতৃত্বের ভূমিকা। অথবা ভবিষ্যতের একজন সম্ভাবনাময় নেতা।

(চলবে)

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।